দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সন্ত্রাস দমনে ক্যাম্পাস পুলিশ অপরিহার্য

আহমেদ সেলিম রেজা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস প্রতিরোধে এ পর্যন্ত বহু লেখালেখি হয়েছে। সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বহু মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কতিপয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সকলের সফল প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সন্ত্রাস অব্যাহত গতিতেই চলছে। সন্ত্রাস এখন রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'শান্তি বাহিনী' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস' এখন সমস্যা। উভয়ই আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য সমভাবে সক্রিয়। শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাস ইতোমধ্যে রাজনৈতিক চরিত্রের সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। সেখানে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তথাপিও সরকার এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে সমস্যাকে মোকাবিলা করতে বরাবরে সক্রিয় ও সচেতন থেকেছে। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কতিপয় সরকারী গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও পলিসি গৃহীত হয়েছে। যাতে ঐ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার ও জননিরাপত্তাকে নিশ্চিত করেছে। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে রীতিমতো স্বায়ত্তশাসন জারি করতে হয়েছে। বিডিআর ও বিশেষ নিরাপত্তা পুলিশ নিয়োগ করতে হয়েছে। সরকারের কোটি কোটি টাকা আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে কার্যতঃ শান্তি বাহিনী দমনে ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু খোদ রাজধানী শহরের বিখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক যুগেরও অধিককাল যাবৎ যে সন্ত্রাস বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে— এ জন্য কোন সরকার এ পর্যন্ত কয়টি কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন? কী নীতি ও পলিসি গ্রহণ করেছেন? সকলেরই তা ভালো করে জানা আছে।

আজ সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজীর কাছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গোটা জাতি জিম্মি হয়ে পড়েছে। ভিসি দম দেয়া পুতুলের মতো একবার চ্যান্সেলর ও একবার ছাত্র নেতাদের সাথে অনবরত সংলাপ চালিয়ে গমদগর্ম হচ্ছেন। অবশেষে সিন্ডিকেটের মিটিং ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে দম নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। কারণ এর বেশী কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি জরুরী মুহূর্তে পুলিশের সাহায্য চাইতে পারেন মাত্র। কিন্তু পুলিশ তাঁর আজ্ঞাবহ নয়। পুলিশ এ্যাকশনে যায় হাই কমাণ্ডের ইচ্ছায়। হাই কমাণ্ড বিবেচনা করেন রাজনৈতিক পরিস্থিতির। ভিসি সেখানে অসহায় দর্শক বৈ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন স্বায়ত্তশাসন জাতির জন্য লজ্জার ও অপমানকর। এই পক্ষাগতগ্রস্ত স্বায়ত্তশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা জাতিকে কোন অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিক্ষেপ করছে— এ কথাটি ভেবে দেখার কি কেউ নেই? কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মনিরুজ্জামান প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার স্ট্যাটাস কি? আপনার নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব কার? আপনার অফিসে হামলা হয় কিভাবে? ক্যাম্পাসে কি তখন পুলিশ ছিল না? এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া কি? তিনি হেসে বলেছিলেন, আমি ভিসি। এইটুকু। আর যখন বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট তৈরি হয় তখন এটা চিন্তাই করা হয়নি যে, ছাত্ররা ভিসি অফিস হামলা করতে পারে। এরপর অন্য কোন বিষয়ে তিনি কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। আসলেই কি বলবেন তিনি? কী বলে কার কোপানলে পড়বেন? ভাবতে অবাক লাগে যেখানে পুলিশেরা আক্রান্ত হলে নিজ দায়িত্বে গুলী চালাতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে জনতার ওপর গুলী চালানোর নির্দেশ দিতে পারেন। ভিসি নিজেও কথিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গুলী চালাতে নির্দেশ দিতে পারেন। দুর্ভাগ্য জাতির যে, কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী যখন ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর জাতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরকে রণাঙ্গনে পরিণত করে ফেলে তখন একজন ভিসির কিছুই করার থাকে না। এমনকি তার সামনে কেউ মরে গেলেও না। নিজে আক্রান্ত হলেও না। তার পরেও একজন ভিসিকে শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সমগ্র ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে? এ কেমন স্বায়ত্তশাসন? এ কেমন আইন ও এ্যাক্ট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসের কারণে এ পর্যন্ত সরকারী, বেসরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি হয়েছে কত তার হিসেব কি কেউ কখনো করে দেখেছেন? সেই ক্ষতি কি শান্তিবাহিনীর ক্ষতির চেয়েও কোন অংশেই কম? রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস কি শান্তি বাহিনীর অপতৎপরতার চেয়ে আরো অধিক ক্ষতিকর ও ভয়াবহ নয়? জাতি কি বসে বসে সেই ভয়াবহ পরিণতি দেখার জন্যই অপেক্ষা করবে? এ জন্য গঠনমূলক কিছুই কি করার নেই? বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস দমনে সরকার কি কিছুই করতে পারেন না? পারেন— সকলেই পারেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে রাজী নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সুযোগটুকুই কাজে লাগাচ্ছে সন্ত্রাসীরা। সঠিক অর্থে বলতে গেলে পরিকল্পিতভাবে এই সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে ফাঁক রেখে। ভিসি'র ক্ষমতা সুস্পষ্ট না করে। শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং জিইয়ে রেখে। রাজনৈতিকভাবে সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসিত করার সুযোগ রেখে।

তা না হলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় সকলে মিলে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভার্নমেন্ট থেকে পার্লামেন্টারিয়ান ফর্ম অব গভার্নমেন্টে চলে আসার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। সেখানে কোন বিরোধ থাকছে না। যত বিরোধ সব এসে কেবল জট পাকাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে। কেন? সরকার ও বিরোধী দল মিলে কি সন্ত্রাসের সকল পথ বন্ধ করতে পারেন না? শিক্ষকদের গ্রুপিং বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে পারেন না? বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে সংশোধন এনে ভিসিকে আরো সক্রিয় ও কার্যক্রম করে তোলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন কি সংবিধান সংশোধনীর চেয়েও জটিল কিছু? বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন ভিসি কি একজন ডিসি'র চেয়েও কম ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ততোধিক নাজুক অবস্থানে অবস্থান করছেন না? জাতি কি একজন ভিসিকে রাষ্ট্রীয় কোন স্ট্যাটাস দিতে পারে না? বা ভিসিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধানে আরো অধিক কার্যকর প্রমাণিত করবে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কি একটি পৃথক বাহিনী গড়ে তোলা যায় না। যারা ভিসির নিকট তথা সিন্ডিকেটের নিকট জবাবদিহি করতে দায়ী থাকবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকারী নিজস্ব বাহিনী রয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে ঐ বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এখতিয়ারে ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য সরকারের মধ্যে ক্যাম্পাস পুলিশ গঠন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে। সন্ত্রাস দমনে ক্যাম্পাস পুলিশের প্রয়োজনীয়তাও আজ অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস দমনে 'সুই সাইড স্কোয়াড'ও গঠন করা হয়েছে। এসব শুনতে ভালো শোনালেও আসলে কিছুতেই কিছু হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে সংশোধন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভিসিকে আরো অধিকতর ক্ষমতা ও নিরাপত্তা দেয়া না যাবে। তাছাড়া আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমলাদের অবস্থান কোথায়?